নির্বাসিতের জবানবন্দি

সুলতান আবদুল হামিদ রহ. এর দিনলিপি

নির্বাসিতের জবানবন্দি

উসমানি খেলাফতের পতনের ঐতিহাসিক দলিল

মুহাম্মদ শাহেদ হাসান
অনূদিত

নাশাত

নির্বাসিতের জবানবন্দি

মূল : সুলতান আবদুল হামিদ রহ.
অনুবাদ : মুহাম্মদ শাহেদ হাসান
নীরিক্ষণ : মাহদি হাসান

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২১

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৭১০৫৬৪৬৭১
www.nashatpublicetion.com
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
বানানসংশোধন : আবদুল্লাহ মুহাম্মদ

মূল্য : ২৬০ (দুইশ ষাট) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

আমার জীবনজুড়ে স্নেহ ও শাসনের অকৃত্রিম উদারতা নিয়ে যিনি বিরাজমান—আমার মনখারাপের উপশম ও আমার আল্লাহপ্রদত্ত পার্থিব ভরসাস্থল; আমার মহান পিতা সেরেতাজ জনাব দেলোয়ার হোসেন হাফিজাহুল্লাহকে। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম ও বিশ্বস্ততম প্রিয়জন। আমার আব্বুর সুস্থ সবল সুদীর্ঘ ও নিরাপদ জীবন কামনায়।

পৃথিবীতে আমার চোখমেলার পথে—অবর্ণনীয় কষ্ট ও যাতনা ভোগ করে যিনি আমাকে মার্জনার অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন, আমাকে যিনি বুকে জড়িয়েছেন ছলনাহীন নিখাদ মমতায়; শতজনের কাছে ক্ষুদ্র কেউ সত্ত্বেও যার কাছে আমিই ভরসা ও আস্থার মহাবিশ্ব—আমাকে যিনি মায়া ও ছায়ায় লালন-পালন করেছেন এবং করছেন—সেই মায়ের আত্মার চিরন্তন প্রশান্তি এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর জন্য হাসানাহ কামনায়।

আমার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও কল্যাণকামী—সবার সফলতা কামনায়। এই বই একমাত্র মহান রবের রহমত ও রাসুলের শাফায়াত লাভের জন্যই।

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد

হৃদয়ে যারা লালন করতেন ইসলামের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, ঈর্ষণীয় আত্মমর্যাদাবোধ যাদের ব্যক্তিসত্তাকে রেখেছিল পবিত্র ও কলঙ্কমুক্ত, তাদেরই একজন ছিলেন সৌভাগ্যবান সুলতান—দ্বিতীয় আবদুল হামিদ। জীবনের চৌত্রিশটি বসন্ত তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন উম্মাহর কল্যাণে। তিন মহাদেশব্যাপী বিস্তৃত উসমানি সালতানাতের মাধ্যমে তিনি রক্ষা করেছেন মুসলিম উম্মাহর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। এতো সুমহান সালতানাত পরিচালনার অজুহাতে নিজের সম্পত্তি বাড়াবেন তো দূরে থাক, উলটো অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন আপন সম্পত্তির বহুলাংশ। নিজে না খেয়ে জনতাকে খাইয়েছেন। নিজে না পরে জনতাকে পরিয়েছেন। মুসলিম ও গণমানুষের মেধাবিকাশে তিনি অসংখ্য মাদরাসার পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পলিটিক্যাল সাইন্স ও মেডিকেল সাইন্সের উপর স্বতন্ত্র কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শেষপর্যন্ত নিজের সালতানাতও হাতছাড়া হয়েছে স্রেফ জাতির সাথে সততা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্করক্ষার 'অপরাধে'—ফিলিস্তিনের এক টুকরো মাটি ছিল তার কাছে গোটা পৃথিবী-সমমূল্যের। তিনি চাইলেই পারতেন নিজের গদি-রক্ষায় যা-তা করতে। আমরণ পারতেন ভোগের পেয়ালায় ঠোঁট সিক্ত রাখতে। কিন্তু তিনি তো ছিলেন মুত্তাকি খলিফা—আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মুমিনগণ তো আত্মমর্যাদায় যত্নশীলই হন; সত্যের পক্ষে জীবন গেলেও মিথ্যার সাথে আপস করা তাদের জন্য সম্ভব হয় না।

নির্বাসিতের জবানবন্দি শুধুমাত্র দিনলিপিই নয়; এটি প্রত্যেক মুসলিম ও ইতিহাসবিদের অবশ্যপাঠ্য নথিপত্র। নির্বাসিতের জবানবন্দি না পড়লে কিছুতেই উঠে আসা সম্ভব হবে না ঐ গহ্বর থেকে—যা গভীর চক্রান্ত ও কূটচালের আশ্রয়ে খনন করেছে জ্ঞানপাপী মিথ্যুক ইতিহাসবেত্তারা। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ এই একবিংশ শতাব্দীতে নতুন নয়, আগেই ছিল; মনে হয় কেয়ামত অব্দিই থাকবে। এই দিনলিপি তিনি নির্বাসনে বসেই লিখেছেন (শ্রুতিলিখন)। বার্ধক্যের আঘাতে আহত সুলতান তো আর নিজে লিখতে পারতেন না; তাই তিনি অতীতের স্মৃতিচারণ করেছেন; অন্যেরা লিখেছে। জবাব দিতে ভোলেননি ঐসব মিথ্যাচার ও আরোপিত অপবাদের, যা অন্যায়ভাবে তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। সুলতান আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে মিডিয়া প্রোপাগান্ডা বহু আগ থেকে শুরু হলেও পুরোদমে শুরু হয়েছে ১৯১৭ এর পরে; তাকে পরিপূর্ণভাবে

ক্ষমতাহীন করার পরে। নির্বাসিতের জবানবন্দি যদিও-বা দিনলিপি, তবে গতানুগতিক ধারার কোনো দিনলিপি নয়। এটি বলা যায় স্মৃতিকথা এবং সুলতানের প্রতি আরোপিত আপত্তির জবাবসংকলন। নির্বাসনের দিনগুলোতে লিখিয়েছিলেন মাত্র চল্লিশদিনে; ১৩৩৩ রোমান বর্ষের ১ম মার্চ থেকে ৮ এপ্রিলের মধ্যবর্তী সময়ে। এখানে তিনি নানাঘটনা লিখেছেন, চাপা-পড়া বহু সত্য তুলে এনেছেন। রটানো অপবাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। দিন-তারিখসহ ঘটনাগুলো উল্লেখ না করলেও মূল ঘটনাগুলো ঠিকই উল্লেখ করেছেন—যার হাত ধরে আমরা পৌঁছতে পারব এমন এক অবগতির দর্পণে, যেখানে স্পষ্টতই দেখা যাবে মুসলমানদের সর্বশেষ খেলাফত ও বিশ্বক্ষমতা হারানোর আসল ও সত্যপুষ্ট চিত্র।

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের চোখের কাঁটা ছিলেন সুলতান আবদুল হামিদ। ওরা এই মহান সুলতানকে সহ্যই করতে পারত না। ওদের আশা তার কাছে এসে হতাশায় বদলে যেত। ওদের স্বপ্ন এখানে এসে দুঃস্বপ্নে পালটে যেত। খ্রিষ্টানরা চাইত গণতন্ত্রের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ুক গোটা খেলাফত-অঞ্চলে। কিন্তু আবদুল হামিদ বলতেন খেলাফতের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। মুসলিম উম্মাহর জন্য যে গণতন্ত্র নিরাপদ ও কল্যাণকর নয়, তা বহুআগেই সুলতান আবদুল হামিদ উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, ধর্ম ও ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠাই কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ। এখানে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের থিউরি অকেজো। জাতীয়তাবাদ এসে বলবে তুর্কি মুসলিম ও আরব মুসলিমের মাঝে দেয়াল দাঁড় করাতে। গণতন্ত্র এসে বলবে আল্লাহপ্রদত্ত আইনের বদলে অধিকাংশ লোকের মনমর্জি মেনে রাষ্ট্রপরিচালনা করতে। আর যাই হোক—গণতন্ত্র মুসলিমদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। আর ইহুদিরা চাচ্ছিল আলকুদস। সুলতান আবদুল হামিদ বলেছিলেন, তোমাদেরকে আমি অন্যত্র কোথায় বসবাসের অনুমোদন দিতে পারি; কিন্তু আলকুদস নয়। আলকুদস মুসলিমদের পবিত্র ভূমি এবং তারাই এর একমাত্র বিশ্বস্ত রক্ষক। আলকুদস মুমিনদের ছিল, তাদেরই থাকবে। ইহুদিরা নানারকম লোভ দেখাল সুলতানকে, তিনি এতে দমলেন না। পরে ওরা কী করল, ওসবের বিবরণ এই দিনলিপিতেই পাবেন।

একটা কথা কী জানেন—ঘরের ইঁদুর শত্রু হলে বনের বাঘের দরকার হয় না। আমাদের খেলাফত আমাদেরই নামধারী কিছু লোকের হাতে আহত হয়েছে। এমনকি নিহতও হয়েছে আমাদেরই আতাতুর্কের হাতে। ওরা শুধু করতালি দিয়েছে। পেট্রোলের যোগান দিয়েছে। লাকড়ি সংগ্রহ করে দিয়েছে। আগুন জ্বালানোর কাজটা তুর্কি কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস,[১] 'মুসলিম'রাই করেছে। মিদহাত পাশা, মুরাদ বেগ,

[১] যা পরবর্তীতে ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস পার্টি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে; এটি ছিল একটি গোপন বিদ্রোহী সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উসমানি সালতানাতে এদের দৌরাত্ম্য চালু ছিল। উসমানি খেলাফতের পতনের পেছনে এদের ছিল সক্রিয় ভূমিকা।

হুসেন আউনি পাশা, শরিফ হুসেইন, সাইদ পাশা, তালাত পাশা, কামাল বেগ, ড. নাজিমসহ কতিপয় তুর্কি তরুণের মতো 'মুসলমান'রা খেলাফত 'হটানো'র মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেছে। ওদের পত্রপত্রিকাও তখন ইসলামের বিরুদ্ধে লিখছিল। নানাভাবে সুলতান আবদুল হামিদ আক্রমণ ও অপবাদ দ্বারা বিক্ষত হয়েছিলেন। এসবের উদ্দেশ্য ছিল একটাই—ইসলামি ঐক্যশক্তির বিনাশ ঘটানো। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আপনি দেখবেন, সুলতান আবদুল হামিদ রহিমাহুল্লাহর শত্রু কোনো মুমিন-মুসলিম ছিলেন না; বরং ছিল ইহুদি-খ্রিষ্টান এবং কিছু মুসলিম নামধারী মুনাফিক।

অনুবাদ ও সম্পাদনা বিষয়ে দুয়েকটি কথা বলেই আমি বিদায় নেব। আমাদের জানামতে সুলতান আবদুল হামিদের দিনলিপির বাঙলা অনুবাদ এটিই প্রথম। সেজন্য আমাদের দায়বদ্ধতা ও কর্মচাপও ছিল সাধারণভাবেই বেশি। আমরা চেষ্টা করেছি সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল হয়ে অনুবাদ ও সম্পাদনাকার্য সমাপ্ত করতে। মূলের অধিকতর নিকটবর্তী অনুবাদ করতে সচেষ্ট থেকেছি। সেইসাথে ভাষাগত সাবলীলতা ধরে রাখতে চেয়েছি। বইয়ের বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য বেশকিছু টীকা সংযুক্ত করেছি। সর্বাধিক আলোচিত তুর্কি নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিপরিচয় তুলে ধরেছি। পরিশিষ্টে জুড়ে দিয়েছি সুলতান আবদুল হামিদ রহ. এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, উসমানি সালতানাতের ইতিহাস ও উসমানি খেলাফতের পতনকাহিনি। বইটি বোঝার পথে পাঠক-পাঠিকাদের চেয়েছি সবচেয়ে আন্তরিক সহায়তা প্রদান করতে। ভুল তো মানুষেরই হয়। আমাদের হওয়াও অসম্ভব নয়। বইটি নির্ভুল করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রয়ে যেতে পারে বহু ভুল, সেজন্য আমরা পাঠক-পাঠিকার কল্যাণকামিতা আশা করছি। আমাদের সৎ ও সঠিক পরামর্শ দিয়ে অনুপ্রাণিত ও আশাবাদী করবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের হোন, আমরাও যেন হতে পারি তার।

و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد و آله و أصحابه أجمعين و
الحمد لله رب العلمين

মুহাম্মদ শাহেদ হাসান
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
৮ নভেম্বর ২১; বেলা ১১:৩৫

সূচিপত্র

ইংরেজি বর্ষপঞ্জি ও হাসির খোরাক :
আমার দিনলিপিতে ইতিহাসের রঙ :
যারা আমাকে ব্যথা দিয়েছে তারাই মুরাদকে নায়ক বানিয়েছে :
ভবিষ্যৎ সুলতানের মনে সাহিত্যিকদের ভয়! :
ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ :
সমালোচনাকারী সাহিত্যিকরা যেমনই হোক তারা আমার আপনজন :
ডাক্তার নাজিম : ইউনিয়নপন্থি বিদ্বেষী :
আমি বনাম ওরা : অবদানের অংক :
ঋণ তিনশ মিলিয়ন থেকে ত্রিশ মিলিয়নে :
মিদহাতের যুদ্ধাগ্রহ : আমি দায়ী হবো কেন? :
রাশিয়াযুদ্ধে আমার সেবাসমূহ :
মিদহাত পাশা : ভালো গভর্নর তবে ব্যর্থ কূটনীতিক :
চাচার অনুগ্রহ আর আউনি পাশার বিদ্রোহ :
একরোখা মিদহাতের গণতন্ত্রমুখিতা :
মিদহাতপন্থিদের মাদকাসক্তি :
মিদহাতের মৃত্যু : আমার অসম্পৃক্ততা :
ইতিহাসে আমার এবং অন্যান্য শাসকের পার্থক্য :
পাশ্চাত্যের অন্ধ-অনুসরণই মিদহাতের গণতন্ত্র :
সংবিধানের বিরুদ্ধে শুধু আমি নই :
মিদহাতের সংবিধান-খসড়া কেন গৃহীত? :
প্রতারিত মিদহাতের বিদ্রোহচিন্তা :
গণতন্ত্র কি মুসলিমজাতির জন্য কল্যাণকর? :
সম্মান তো পাবই তবে মৃত্যুর পর :
আত্মহত্যা নয়, হত্যার শিকার তিনি :
সেনাপতির মাথায় চাচাকে উৎখাতের চিন্তা :
মিদহাত : মক্কানেতার চক্ষুশূল :
মিদহাতকে তায়েফ থেকে মিশর নেওয়ার অপচেষ্টা :
প্রশান্ত হৃদয়ে রবের মুখোমুখি হবো :
সুরক্ষায় সর্বশক্তিই তো প্রয়োগ করেছি :
শাসকের আবশ্যক বৈশিষ্ট্য হলো বুদ্ধিমত্তা :
মাথামোটা মন্ত্রীর পদচ্যুতি জরুরি :

সিরিয়ার গভর্নর কামিল পাশা :
সাইদ পাশার কাহিনি : খুঁটির বদলে সাপ :
মিশর-তিউনিসিয়ার সমস্যা সমাধানের কৌশল :
যুদ্ধের আগে চাই বিনির্মাণ :
রোমানিয়া দখলপ্রচেষ্টায় ছাইকালি :
সেনাপতি তো আমার শত্রুদের পুতুল :
দুষ্টকে দুধভাত খাওয়াতে নেই :
প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি তো শত্রুদেরই কুকুর :
আমার মন্ত্রীরাই যুদ্ধাযুদ্ধি করছিল :
মিদহাতের কর্মকাণ্ডে অন্য মন্ত্রীরা অতিষ্ট :
উসমানি সালতানাতের অধিপতি হওয়ার শখ :
ফ্রিম্যাসনবাদী মিদহাত পাশা :
মিদহাতের পদচ্যুতিতে ইংল্যান্ডের মাথাব্যথা :
সুলতানের রক্তে রঞ্জিত মিদহাতের হাত :
ব্রিটিশ-ফরাসি দূতাবাসে মিদহাতের যোগসাজশ :
ফাঁসির রায় করেছি শিথিল :
নামিক কামালের পরিচয় :
ইয়াং তুর্কি ইউনিয়ন ও ফ্রিম্যাসনের ব্রিটিশ সেন্টার :
মন্ত্রীর শর্ত মেনে নাকি সুলতান হয়! :
আর্মেনিয়া সঙ্কট :
উসমানি খেলাফত ধ্বংসে কাফেররা একজোট :
আর্মেনিয়া : দয়ায় দাপটে দোদুল্যমান :
উসমানি খেলাফত বিনাশের পশ্চিমা পদক্ষেপ :
ব্রিটেন চাচ্ছে আর্মেনিয়া থেকে মিশরে জনমত ফেরাতে :
ইয়াং তুর্কি ইউনিয়ন ও আর্মেনিয়ার কূটচাল :
যেখানে আমার অপসারণের পরিকল্পনা হয়েছে :
পারস্পরিক শত্রুভাবাপন্ন ইউরোপীয় শক্তি উসমানিদের বিরুদ্ধে : ঐক্যবদ্ধ :
বিরোধীদের কেন সাহায্য করলাম? :
ঔপন্যাসিক মুরাদ বেগ ও তার পত্রিকা :
আমার বিরোধিতাকারীদের ত্রাণকর্তা যারা :
অকর্মাদেরকে ফ্রিম্যাসনবাদীরা যা বানিয়েছে :
আমার বড় উদ্দেশ্য কী ছিল? :
আমার রাজনীতি :
রাষ্ট্রের দুর্দশায় জ্ঞানীরা ব্যথিত :
রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক হালচাল :

কাফেররা ঐক্যবদ্ধ আমরা বিচ্ছিন্ন :
ওরা ফিলিস্তিনের দাবিদার :
পশ্চিমাদের লক্ষ্য... :
সেনাবাহিনীতে নেতৃত্বভাগের পরিণতি :
আত্মরক্ষার স্বার্থে কি নৌবাহিনী দায়িত্বমুক্ত?
খেলাফত যেন প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধাস্ত্র :
জামালুদ্দীন আফগানির স্বরূপ :
ওদের উন্মাদনা এবং আমার পরিকল্পনা :
ব্রিটেন ও জার্মানির সুযোগই তো এটা :
ফ্রিম্যাসনবাদ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল :
পেট্রোল ও আমাকে সরানোর ধান্দা :
জার্মানও কি পেট্রোল খোঁজে :
ব্রিটেন কী খোঁজে ইরাকে? :
ইরাকে পেট্রোল আবিস্কার :
পেট্রোল উত্তলনে আমার নিষেধাজ্ঞা :
তুর্কি বনাম আরব খেলাফত : পেট্রোলই যেখানে মুখ্য :
ব্যক্তিগত গোয়েন্দাসংস্থা কেন জরুরি? :
মনের আগুনে জ্বলছে যারা :
মেধা ও বুদ্ধির মূল্যায়নে আমার কাজই সাক্ষী :
শুরুতেই টেলিগ্রাম-ব্যবস্থার প্রবর্তন :
বিশেষ খরচে সাবমেরিন তৈরির অভিজ্ঞতা :
সাইদ পাশা : দিনশেষে ক্ষমতারই গোলাম :
পরিশ্রমী সেনাপ্রধানের সম্মান প্রাপ্য :
তুনা-জোটের সেনাপতি সোলাইমান পাশা :
সোলাইমান কিন্তু মিদহাতেরই বন্ধু ছিল :
সোলাইমান সেনাপতির মাথার ঘিলু :
ইংরেজদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর মাখামাখি :
নিজ প্রচেষ্টায় টেলিগ্রামের ব্যবস্থা :
রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরাজয়ের কারণ :
রাদিফ পাশার স্বরূপ :
ন্যায়পরায়ণতা : উসমানি সালতানাতের ভিত্তি :
গোয়েন্দা সংস্থা : ওদের নেকামো :
নেতৃত্বের হকদার তো মুসলিম উম্মাহ :
কিছু যুবক ইউরোপে গেল তারপর... :
জাতীয় কল্যাণে গোয়েন্দা সংস্থা :

আমি এক অসহায় মালি... :
৩১ মার্চের দুর্ঘটনা : আমার বক্তব্য :
ইউনিয়ন পার্টির কর্মীদের পলায়ন :
পত্রিকাই যখন যুদ্ধাস্ত্র :
আমি ওদের গতি রোধ করিনি :
স্বেচ্ছায় আমি সিংহাসন ছেড়েছি... :
জাপান এবং উসমানি সালতানাত : পার্থক্যরেখা :
এই দুটোর মধ্যে বড় কোনটি? :
হতাশাই যখন কোনো সেনাদলের ব্যাজ :
খলিল বেগ আলবানি : সাদা মনের মানুষ :
কাফেরদের হাতে-পায়ে নাকি ধরেছি? :
ধৈর্য ও অবিচলতাই আমার শক্তি :
আমাকে অপসারণ : ওদের মুখের ভাষা :
দুঃখ অপসারণে নয়; বরং অসদাচরণে :
মনের বাঘই করছে তাড়া :
খলিফাতুল মুসলিমিন বন্দি ইহুদি মহলে? :
আমাকে হত্যাচেষ্টা : রক্ষক যখন ভক্ষক :
হত্যাচেষ্টার দলিল এবং সেকেন্ড কমান্ডার :
পত্রিকা পাঠেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ :
আমাকে অপসারণের পর প্রাসাদ লুণ্ঠন :
উন্মাদ সেনারা আমার সম্পত্তিও চায় :
সেনাবাহিনী : দেশের ভেতর দেশ :
ক্ষমতায় ওরা কিন্তু ভয় পায় আমাকে :
যে সম্পদে সেনাদের লোভ :
আমার শর্তারোপ :
যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয় :
খেলাফতের মুহাফেজ আল্লাহ তুমিই :
সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরে বাধ্যবাধকতা :
আমার দিনলিপি এবং ওদের শঙ্কা :
দ্বিতীয় নির্বাসনে লিখছি এই দিনলিপি :
ইতিহাসের আয়না থাকবে স্বচ্ছ নির্মল :
বলকান যুদ্ধে রাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতি :
ইসলামের বিরুদ্ধে গির্জাগুলোর ঐক্যবদ্ধতা :
গির্জা সমাচার : আমি বনাম ইউনিয়নপন্থি :
এতো সহজেই থেসালোনিকি ছাড়ব না :

সেনাবাহিনীর রাজনীতিই পরাজয়হেতু :
প্রথম নির্বাসন থেকে দ্বিতীয় নির্বাসনে :
আমাদের ভূমিতেই আমাদের শান্তি :
বেদনায় বিদীর্ণ হৃদয়ের ছবি :
সংসদসদস্য : চোরে চোরে খালাতোভাই :
প্রতিরোধ ক্ষমতা কেন কোনদিনের জন্য? :
তালাত পাশা : অতীত এবং বর্তমান :
ইস্তাম্বুল ছাড়ার আহ্বান নিয়ে তালাত :
আনোয়ার পাশাও আমার কাছে আসবে :
একটা দুঃখজনক বাস্তবতা :
ভুল তথ্যে নির্ভর করে নির্ভুল সিদ্ধান্ত? :
তুমি ছাড়া মাওলা মোদের : নেই কেউ নেই :
পরিশিষ্ট :
আত্মমর্যাদার শুভ্রতম মিনার :
মুসলমানদের সর্বশেষ ক্ষমতাধর খলিফা :
জন্ম ও শৈশব : শিক্ষার সোনাঝরা দিন :
ইউরোপের পথে চাচার সাথে :
শাসনভার গ্রহণ ও খেলাফতের মুকুট :
তার শাসনামল : নানা বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত :
বেলা ডুবলো বিজয়ের :
মানুষের চোখে, জনতার চোখে :

নির্বাসিতের জবানবন্দি

ইংরেজি বর্ষপঞ্জি ও হাসির খোরাক

নতুন বছর সমাগত। সৌভাগ্যের সন্ধানে আরও কিছুদিন ঘাম ঝরাতে পারব। সুদিনের সুফল আমরাও লাভ করব।

আমরা দুটি দিন-তারিখ সামনে রেখে চলি। একটি হিজরি, যা শুরু হয় মহররম মাস থেকে। দ্বিতীয়টি রোমান দিন-তারিখ, যা শুরু হয় পয়লা মার্চ থেকে। তো এভাবেই হিজরি এবং রোমান দিন-তারিখ সামনে রেখে যাবতীয় কার্যবিধি নির্ধারণ করে উসমানি সালতানাত।

অধুনা আরেকটি তারিখ সামনে রেখেও অনেকে চলে, সেটার প্রথম মাস হলো দ্বিতীয় কানুন। আর শেষমাস প্রথম কানুন। কী হাস্যকর ব্যাপার, তাই না! প্রথমমাস হলো দ্বিতীয় কানুন, আর শেষমাস হলো প্রথম কানুন। হতে পারত বিপরীত। প্রথম মাস প্রথম কানুন আর দ্বিতীয় বা শেষমাস দ্বিতীয় কানুন। এটা যেন বাবার জন্মের আগে ছেলের জন্মের মতো।[২]

আশাকরি, উসমানি সালতানাতের মন্ত্রিপর্ষদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং তৃণমূল পর্যায়ের গণতান্ত্রিক নেতা ও পার্লামেন্ট-মেম্বারসহ দায়িত্বশীলদের সবাই বিষয়টি ভাববেন। সম্মানিত ভাই মুহতারাম সুলতান মুহাম্মদ রাশাদও বিষয়টি বিবেচনায় রাখবেন বলে আমি আবদুল হামিদ আশাবাদী।

মনে রাখতে হবে, উপরে আমি কয়েক লাইন লিখেছি সাদা মন থেকে। কেউ এটাকে বাঁকাভাবে নিতে পারবে না। বলা যাবে না যে, ওই দ্যাখো; বেটা আবদুল হামিদ পশ্চিমা ক্যালেন্ডারের বিরোধিতায় মজেছে! আমি বিষয়টি উত্থাপন করলাম, যেন উসমানি সালতানাতে 'আধুনিক জোয়ারে' আগত কোনো বিষয় খুঁটিয়ে দেখার মানসিকতা তৈরি করা যায়। ভুল থাকলে সময়ের বিজ্ঞ মানুষের নির্দেশনায় তা শুধরে নেওয়া যায়।

আগে আমরা শুধু আরবি ও রোমান নববর্ষ উদযাপন করতাম। হাল আমলের মডার্নেরা তো ইংরেজি নববর্ষও উল্লাসে উদযাপন করে।

বাইলারবেই প্রাসাদ, ইস্তাম্বুল
১ মার্চ ১৩৩৩ (রোমান বর্ষপঞ্জি)
১৩৩৬ হিজরি; ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ

---

[২] প্রথম কানুন মানে ডিসেম্বর আর দ্বিতীয় কানুন মানে জানুয়ারি।

আমার দিনলিপিতে ইতিহাসের রঙ

দিনলিপি আমি আজকালই নতুন লিখছি না, আগেও লিখেছি। কিন্তু সালতানাতের মহান জিম্মাদারির তাড়া থাকায়, নিয়মিত দিনলিপি লেখা সম্ভব হয়নি। আজকাল তো লিখি। অতীতকে আঁকার চেষ্টা করি। বিগত দিনের লেখাগুলো জমা করার চিন্তাও মাথায় ঘুরঘুর করছে। বর্তমান এবং অতীতের লেখাগুলো একত্র হলে বেশ তথ্যবহুল একটি দিনলিপি-সংকলন প্রস্তুত হতে পারে।

সুদীর্ঘ সুন্দর একটি জীবন আমি কাটিয়েছি। একাধারে কয়েকযুগ তিন মহাদেশব্যাপী প্রসারিত সাম্রাজ্যের পরিচালনা করেছি। বহুবিধ অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হয়েছি। জমিন ও জনতার সাথে মিশে গিয়েছি ধুলোর মতন। তাই আমার জীবন আর আমার থাকেনি। ছড়িয়ে পড়েছে জনপদ থেকে জনপদে। দেশ থেকে দেশান্তরে। আসলে আমার দিনলিপি শুধু আমারই নয়; বরং আমার জাতি ও জনতার জীবনদর্পণ। হারানো দিনরাতের মায়াবী মুখচ্ছবি। জ্ঞান গৌরব সাফল্য এবং ব্যর্থতারও মায়াময় জানালা। আমি বিশ্বাস করি—আমার দিনলিপিও ইতিহাস। এটি ছাড়া ইতিহাস পূর্ণতা পাবে না।

সালতানাতে উসমানির প্রধান যখন ছিলাম, বুদবুদের মতো ব্যস্ততা ঘিরে থাকত আমাকে। সুশৃঙ্খল লেখাপড়ার অবসর পেতাম না। অবস্থা অনেকটা আমার ভাই ও বর্তমান সুলতান জনাব মুহাম্মদ রাশাদের মতোই ছিল। উনি আমার পরেই ক্ষমতায় সমাসীন হয়েছেন।

যারা আমাকে ব্যথা দিয়েছে তারাই মুরাদকে নায়ক বানিয়েছে

আমার বড় ভাই—ফ্রিম্যাসনবাদী সুলতান পঞ্চম মুরাদকে ঘিরে থাকা চাটুকার সাহিত্যিকেরা আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছে। অন্যদিকে সেই তারাই সুলতান মুরাদকে মহাজ্ঞানী কবি ও খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসেবে পত্রপত্রিকায় প্রচার করেছে। আর আমজনতা তো শিশুর মতো। পেন্সিলে আঁকা বাঘের ছবি দেখেই মুগ্ধ। সুলতান মুরাদকে তারা বরণ করে নিয়েছিলেন।

আমার ভাই মুরাদ জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনায় ছিল কিছুটা দুর্বল। ভাষা-সাহিত্য ও রচনায় ভাইজানের অবগতি ছিল শূন্যের কোঠায়। আমি তার লিখিত একটি চিঠির অনুলিপি কাছে রেখেছি। চিঠিটা তিনি ফুয়াদ পাশার পুত্রবধূ বিবি নেয়ামাহর উদ্দেশে লিখেছিলেন। ফুয়াদ তখন উন্নত চিকিৎসার জন্য ফ্রান্সের নিস শহরে অবস্থান করছিলেন।

আমার মরহুম ভাই মুরাদ ভীষণ ভয় পেতেন ফুয়াদ পাশাকে। কারণ, জিয়া বেগ 'রাজকীয় উত্তরাধিকার' বিষয়ে একটি বই প্রকাশ করেছিল। তখনও উনি 'পাশা' হননি। ঘটনাক্রমে এই জিয়াই আমার চাচা সুলতান আবদুল আজিজকে

আবেদন করেছিল ফুয়াদ পাশাকে মন্ত্রী নির্বাচন করার জন্য। কিন্তু ফুয়াদ পাশা মন্ত্রী হয়ে জিয়াকে কোনো 'ফাঁকফোকড়' বের করতে দেয়নি। পরিণামে ফুয়াদের পিছনে বিচ্ছুর মতো লেগে পড়ে জিয়া পাশা। আর এই জিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র ও সহযোগীই ছিল আমার বিকল ভাই 'মাথামোটা' মুরাদ।

ভবিষ্যৎ সুলতানের মনে সাহিত্যিকদের ভয়!

জিয়াকে আমি কখনোই মেনে নিতে পারিনি। যখন সে বেগ[৩] ছিল তখনও না, পরে যখন পাশা[৪] হয়েছে তখনও না। কারণ, সে নিজের কল্যাণে মেধা খরচ করার বদলে বিদ্বেষীদের তাড়া করে বেড়ানোর পেছনেই নষ্ট করত বেশি। সে ছিল চরম হিংসুক এবং প্রতিশোধপরায়ণ। ভবিষ্যৎ সুলতান মুরাদ আফেন্দির (সুলতান পঞ্চম মুরাদ) লিখিত চিঠিটা আমি এখানে তুলে দিচ্ছি। চিঠিই বলে দিবে কী ভয় ও লৌকিকতা এবং ভাষাগত দুর্বলতা নিয়ে মুরাদ লিখত :

> বরাবর
> মাননীয় সম্মানিত সাইয়েদা,
> আপনের শ্বশুর অসুস্থ হইয়া ইউরুপে গিয়াছেন শুনে আমরা ব্যাথা পাইয়াছি মনে। আল্লাহ তারে সুস্থ ও নিরাপদ দান করুন। আমরা এতো দুঃখের শিকার হয়েছি যে, বইলা বুঝাতে পারব না। আল্লাহ তাআ'লা তো শাফি; তিনি সুস্থতার কাঁথায় ঢেকে দিন জনাব ফুয়াদ পাশাকে।
>
> ২১ জুমাদাল আখর, ১২৮৫ হিজরি।[৫]

মুরাদের এই চিঠি লেখার সময় আমি তার পাশেই ছিলাম। দেখেছি তিনি কয়েকবারে এই চিঠিটা লিখেছেন। তারপরও ভাষাগত দুর্বলতার চিত্র এই ছিল।

ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ

থেসালোনিকি দ্বীপে নির্বাসিত হওয়ার পর থেকে লেখাপড়ার অবসর পাই। প্রথম দু-তিন মাস অবশ্য মনখারাপি ও বিষণ্ণতা ঘিরে থাকলেও আজকাল কিছুটা হালকাবোধ করছি। লেখাপড়ায় মন বসাতে পারছি। জ্ঞানের যতো শাখা আছে, তন্মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হলো সাহিত্য এবং ইতিহাস। ইতিহাস ও সাহিত্যপাঠে

---

[৩] বেগ : উসমানি সালতানাতের জেলার তহসিলদার ও কালেক্টরকে বলা হতো বেগ।

[৪] পাশা : সামরিক পদমর্যাদা বা অধিনায়কের সমতুল্য ক্ষমতার অধিকারী বিশেষ উসমানি নাগরিককে পাশা বলা হতো।

[৫] এই চিঠিটা এভাবে উল্লেখ করার মূল কারণ হলো, সুলতান মুরাদের ভয় ও তুর্কি ভাষাগত দুর্বলতা কী পরিমাণ ছিল তা প্রমাণিত করা। যদিও বাংলায় তা তুলে আনা সম্ভব না। কিন্তু আমরা তা অনুবাদে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

আমার মন-মগজ গতিশীল হয়। আলহামদুলিল্লাহ—এখন আমি সাবলীলভাবে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারি। তা ছাড়া শুনে শুনে ফরাসি ভাষার বেশ ক'টা শব্দ-বাক্যও শিখে ফেলেছি। নির্বাসন-জীবনে রুটিনমাফিক লেখাপড়া করছি। অভিধানের সাহায্যে বিদেশি পত্রপত্রিকা খুব সহজেই পড়তে পারছি।

সমালোচনাকারী সাহিত্যিকরা যেমনই হোক তারা আমার আপনজন

হায় আফসোস, ওরা আমাকে শিল্প-সাহিত্যের প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রচার করল। আমাকে নানাভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করল। ওই শিল্পী-সাহিত্যিকেরা আমাকে ঘৃণ্যভাবে চিত্রিত করল। আমি তো শিল্প-সাহিত্যের বিরোধী নই; বরং সাহিত্য-শিল্পে আমি অশ্লীলতার বিরোধিতা করেছি। আমি সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে নই; বরং প্রতারক সাহিত্যিকদের বিরোধিতা আমি করেছি। আমি সামনে দেখাব যে জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ কী পরিমাণ ছিল!

আমি ইস্তাম্বুল থেকে জিয়া পাশাকে সরিয়ে দিয়েছি (মন্ত্রী বানিয়েই হোক কিংবা গভর্নর বানিয়ে)। কিন্তু কেন? আমি কিন্তু গণবিক্ষোভের ভয়ে জিয়া পাশাকে ইস্তাম্বুল থেকে সরাইনি, আমি তাকে সরিয়েছি তার জ্ঞান-প্রজ্ঞার মান রক্ষা করতে। কারণ ইস্তাম্বুলে তার কাজের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। তাই অন্যত্র কাজ করার সুযোগ তৈরির জন্যই আমি তাকে সরিয়েছি।

আমি জিয়াকে যদি নিজে না সরাতাম, তাহলে গণবিক্ষোভে কিছুই আসত-যেত না। কাকে সরাব আর কাকে রাখব এটা একান্তই আমার ইচ্ছা। আচ্ছা, গণবিক্ষোভ তো ওই মিদহাত পাশাকে ধরে রাখতে পারল না—যে ছিল জনমনে প্রভাবশালী আর যে দুই-দুইজন সুলতানের অপসারণেও নেতৃত্ব দিয়েছে। ওই তুমুল জনপ্রিয় মিদহাত পাশাকে যখন ইউরোপে নির্বাসনে দিলাম, কেউ তো সেদিন প্রতিবাদ করার কলিজা নিয়ে দাঁড়াতে পারল না।

আমি যদি সাহিত্য-বিরোধী হতাম, তাহলে নিজ পকেট থেকে নামিক কামাল বেগকে মৃত্যু পর্যন্ত ভাতা প্রদান করতাম না। আর নামিকের ছেলেকেও প্রশাসনে চাকরি দিতাম না।

আমি যদি সাহিত্যের শত্রু হতাম, তাহলে তো আকরাম বেগ[৬] ও আবু জিয়া তাওফিক বেগের[৭] উদ্ধত ও অসংযত আচরণ মাফ করতাম না।

---

[৬] আকরাম বেগ (১৮৪৭-১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ) : কবি ও সাহিত্যিক। পড়াশোনা করেছেন সাংস্কৃতিক ও সামরিক বিদ্যাপীঠে। নামিক কামাল ইউরোপে পালানোর পর তাসবির পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাকে উসমানি তুর্কি সাহিত্যের তারকাপুরুষ ভাবা হয়। সাহিত্যের নানা শাখায় তার অবাধ বিচরণ ছিল।

[৭] আবু জিয়া বেগ (১৮৪৭-১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ) : উসমানি সাহিত্যিক। পড়াশোনা করেছেন ইউরোপে। উসমানি সালতানাতের মজলিসে শুরার সদস্য এবং আর্ট স্কুলের পরিচালক ছিলেন। সুলতান

সাহিত্য যদি হতো আমার চোখের কাঁটা, তাহলে আবদুল হক হামিদ বেগকে প্রতিমাসে মোটা অংকের বেতন দিতাম না। আর আমি তার ক্রমশ ফুলে-ফেঁপে ওঠা ঋণ শোধ করতাম না।

আমার যদি সাহিত্য ও ইতিহাস-সংস্কৃতির প্রতি অনীহা থাকত, তাহলে কথিত ইতিহাসবিদ মুরাদ বেগকে ক্ষমা করতাম না। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমার সিংহাসন ও মুকুটের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীকে আরামদায়ক সুলতানি চাকরির ব্যবস্থা করে দিতাম না।

আমি আবারও বলছি—আমি সাহিত্যিকদের প্রতি আন্তরিক এবং তাদের প্রকৃত বন্ধু। যদি আমি লেখক সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের দুশমনই হতাম, তাহলে জনসম্মুখে তাদেরকে হত্যা করার জন্য আমার লোকজনের অভাব ছিল না।[৮]

৩ মার্চ ১৩৩৩ রোমান

ডাক্তার নাজিম : ইউনিয়নপন্থি বিদ্বেষী

আমার ব্যক্তিগত সচিব 'কাদিকুই' ইস্টিমারে ভ্রমণে বেরিয়েছে। সেখানে একটি কেবিনে তুমুল তর্ক চলছিল। সেটা সচিব শুনে আমাকে বলেছে। চার-পাঁচজনের একটা গ্রুপ বসেছিল আমার সচিবের পাশের কেবিনে। সেই কেবিনে জড়ো-হওয়া-লোকদের একজন মারাত্মক সমালোচনা করল বর্তমান সময়ের হাড়ভাঙা দারিদ্র্যের। দায় চাপিয়ে দিল চলমান শর্তসাপেক্ষ সরকার-ব্যবস্থাকে। আরেকজন এই মত ধারালো ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে বলল, এই দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষের আগুন আবদুল হামিদ জ্বেলেছেন। উনিই মিদহাত পাশাকে বন্দি করে হত্যা করেছেন। শুধু এটুকুই নয়—উনি তো এমনসব পদক্ষেপ নিয়েছেন, যার পরিণতি আমরা আজও ভোগ করছি। আমার সচিব নির্ভরযোগ্য সূত্রে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছে—আমার ব্যাপারে এই বাজে মন্তব্যটা করেছে থেসালোনিকির ডাক্তার নাজিম বেগ।

আবদুল হামিদের বিরোধিতাহেতু তাকে দেশান্তরিত হতে হয়। পরে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন। পুনরায় তার পত্রিকা 'তাসবিরে আফকার' (চিন্তাকল্প) প্রকাশ করেন। আনাতোলিয়া থেকে তিনি পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তার বিখ্যাত রচনা : উসমানি সাহিত্যের উপমা, ইসরাইলি জাতি, ইবনে সিনা, নেপোলিয়ন ও আধুনিক উসমানি (তার বইসমূহের সম্ভাব্য বাংলা নাম উল্লেখ করা হলো)।

[৮] ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস পার্টির প্রথম সারির নেতা তালাত পাশা তার রোজনামচায় সুলতানের হত্যাবিমুখতা বিষয়ে বলেছেন—আর্মেনীয় কূটনীতিক কিরকুর জেহরাব যখন আমাকে বলল সুলতান আবদুল হামিদ তার ভাই মুরাদকে হত্যা করেছেন আমি তখনই তাকে প্রত্যুত্তরে বললাম—অসম্ভব, কস্মিনকালেও সুলতান আবদুল হামিদ কোনো মানুষ হত্যা করতে পারেন না!! (তালাত পাশার দিনলিপি ৩য় খণ্ড / তুর্কি ইতিহাসবিদ জামাল কুতাই সম্পাদিত নোসখা ১/৪৩৭ পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত ১৯৮৩ ইং)

এতকিছু ঘটলেও এই লোক গণতন্ত্রকে দোষী সাব্যস্ত না করে খেলাফতকে দোষী করতেই মরিয়া হয়ে থাকে।

এই ডাক্তার বিগত বিশ বছর যাবত আহমদ রেজা বেগের সাথে জোট করে আমার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে যাচ্ছে।[৯] আমি ওই ডাক্তার সম্পর্কে জেনেছি যে, ডাক্তার নাজিম বেগ ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস পার্টির একজন কট্টরপন্থি কর্মী।[১০] ব্যক্তি হিসেবে উনি ছিলেন আত্মবিমুগ্ধ ও অবিশ্বস্ত। নির্দয় একরোখা এই লোক তার আসল কাজ চিকিৎসাসেবা না দিয়ে বিশৃঙ্খল রাজনীতিতে লিপ্ত থাকত। ছোট-বড় কোনো আদেশই উনি মেনে নিতে পারত না।

ডাক্তার নাজিম বেগের ব্যক্তিসত্তাকে আমি এখানে আলোকপাত করতে চাই না। এই লোককে নিয়ে কত বলব? দোষ তো উনি একটা-দুইটা করেনি। উনি তো আমার পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত উপাধি আমার নাম থেকে মুছে দেওয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছে।

আমি শুধু দুটি প্রশ্ন জুড়ে দিতে চাই। যেসব ফাঁপাবুলি ছেড়েছে নাজিম কাদিকুই স্টিমারে বসে, ওগুলোর জবাবে শুধু দুটি প্রশ্নই যথেষ্ট। বুকে হাত রেখে বলুন নাজিম; আগুন কি আবদুল হামিদই জ্বেলেছে না অন্য কেউ? আবদুল হামিদের পূর্বের তিনশ বছরের ইতিহাসে কি এই আগুনের জ্বালানী মজুদ ছিল না?

থাক, এটা তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্র নয়। এটা ইতিহাস। ডাক্তার নাজিম বেগ ও তার সহযাত্রীদের বিচার ইতিহাসই করবে।

---

[৯] ডক্টর রেজা নুর তার দিনলিপিতে আহমেদ রেজা বেগ সম্পর্কে লিখেছেন—তুর্কি ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস পার্টির সদস্যদের মনস্তুষ্টির জন্য রেজা বেগ অসভ্যের মতো যা-তা অপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। রেজা বেগের ইউরোপ থাকাকালীন বেশ সুনাম অর্জন করলেও ইত্তেহাদিদের স্বার্থে নোংরা সব কাজ করেছেন। অবশেষে আহমেদ রেজা বেগ মজলিসে আইয়ানের সদস্যপদ লাভ করলেও ইত্তেহাদিদের কাছেই উনি ঘৃণিত হয়েছেন। রেজা বেগের মন ছিল ছোট। একপর্যায়ে মজলিসে মাবুসানের প্রধান নির্বাচিত হলেও অসহায়ত্ব ও নীচতা উনার পিছ ছাড়ে নি। মজলিসে এমন সব অপরাধ করেছেন, যা তার ব্যক্তিত্ব ও অবস্থানগত মর্যাদা ধূলিসাৎ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু উনি এসবকিছু তার চেয়ার ধরে রাখতেই করতেন। (রেজা নুরের দিনলিপি, কুয়েতে প্রকাশিত ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ)

[১০] ফাতহি উকেয়ার তার দিনলিপিতে লিখেছেন, তুর্কি ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস পার্টি ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে ইস্তাম্বুলের সামরিক মেডিকেল কলেজের পাঁচজন ছাত্রের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর উসমানি সালতানাতের ভেতরে-বাইরে তাদের কর্মকাণ্ড ক্রমশ বেড়েই চলে। উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের উলুধ্বনি এরাই প্রথম তোলেন। (ফাতহি উকেয়ারের তিন যুগ ৩/৪ ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ)

আমি বনাম ওরা : অবদানের অংক

ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস পার্টিকে আমি শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছি জুলাই ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে। পরবর্তী বছরের এপ্রিলে উসমানি সালতানাতের সিংহাসনে আসীন হন ভাই 'বীর মুজাহিদ' মুরাদ আফেন্দি।[১১]

আমার শাসনামলে উসমানি সালতানাতের সীমানা ছিল একদিকে ইশকুদারা থেকে পারস্য-উপসাগর। অন্যদিকে কৃষ্ণসাগর থেকে আফ্রিকা-মরুপ্রান্তর। ১৯০৮ এবং ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে আমরা সেই বেদনাদায়ক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করি। আমার উত্তরসূরিরা বলতে পারবে যে, দুর্ভোগের আগুন আমি জ্বালাইনি। আমি তো এক বিরাট সালতানাত ও সেনাবাহিনী রেখে গিয়েছি, যেখানে প্রায় ত্রিশ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করছে।

আচ্ছা, সে-কথা থাক। আমাকে অপসারণের পর তো দশ বছর কেটে গেল। এই দীর্ঘ সময়ে আমার এক-তৃতীয়াংশ কাজও কি ইউনিয়নপন্থিরা করতে পেরেছে? এক-তৃতীয়াংশ কেন, এক-দশমাংশ কাজও কি করে দেখাতে পেরেছে?

ঋণ তিনশ মিলিয়ন থেকে ত্রিশ মিলিয়নে

আমি যখন উসমানি সিংহাসনে আরোহণ করি, তখন সাম্রাজ্যের ঋণ ছিল তিনশ মিলিয়ন উসমানি লিরা।[১২] বড় বড় দুটি যুদ্ধে এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়েই ত্রিশ মিলিয়ন লিরা পর্যন্ত ঋণ নামিয়ে এনেছিলাম।

তুর্কি ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস পার্টি ক্ষমতালাভের পর তা কমার বদলে বাড়ল। নাজিম বেগ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ত্রিশ মিলিয়নে কমানো ঋণকে চারশ মিলিয়ন লিরায় নিয়ে গেছে; ইন্না-লিল্লাহ।

তাই বলি, ইউনিয়ন পার্টি তো খুবই উন্নতি করেছে! আমাদের ঋণের বোঝা বাড়ানোতে বিরাট কৃতিত্ব ও সাফল্য দেখিয়েছে! আর ভাই সুলতান মুরাদের কথা বাদই দিলাম; কারণ উনি তো সিংহাসনে বসতে বসতেই মারা গেলেন।

আপনি চিন্তা করুন, কতকিছু টপকে আমি এই পর্যন্ত পৌঁছেছি! আমার উসমানি সিংহাসনে আরোহণের সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা কতটা বিপজ্জনক ছিল! সিংহাসনে বসামাত্র মোকাবেলা করতে হয়েছে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিদ্রোহ, উসমানি বাহিনীর পরাজয়, মন্টিনেগ্রো অঞ্চলে সেনাবাহিনীর অবরোধ ও সালতানাতের বিরুদ্ধে সার্বিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা আর সার্বিয়া যুদ্ধের রেশ না কাটতেই

---

[১১] সুলতান এখানে 'বীর মুজাহিদ' বলে বিদ্রোহীদের কটাক্ষ করেছেন। দুটি তারিখ এখানে স্মরণীয়। ১. ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস পার্টির সুলতান বিরোধী আন্দোলন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ। ২. সুলতান আবদুল হামিদের ক্ষমতাচ্যুতি ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ।

[১২] প্রতি ১ (তুর্কি) লিরা বাংলাদেশি ৮.৬৭ টাকার সমান।

রাশিয়ার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া।[১৩] এইসব অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সমস্যা কিন্তু আমার শাসনামলে সৃষ্টি হয়নি। আমি তো দায়িত্ব নিয়েছি দুই-দুইজন সুলতানের অপসারণ এবং ৯৯ দিন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সালতানাত পরিচালিত হওয়ার পর।

---

[১৩] বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনায় উসমানিদের আঞ্চলিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ দেখা দেয়। অনুরূপ সার্বিয়া ও মন্টিনেগ্রোতেও তারা বিদ্রোহের মুখোমুখি হন। তা ছাড়া ক্রিট দ্বীপের নিরাপত্তাও ঝুঁকির মধ্যে ছিল; তাই মিশরের নেতা ইসমাইল উসমানিদের সাহায্যে কিছু সেনা প্রেরণ করেন।

উসমানি সেনাপতি উসমান পাশা যখন আস্কসিনাজ যুদ্ধে সার্বিয়ান (সাবেক) সেনাপতি এবং (বর্তমান) রাশিয়ান সেনাপ্রধান জেনারেল জার্নাইফের উপর জয়ী হন, তখন উসমানিগণ বেলগ্রেড দখলের চেষ্টা করেন। তখন রাশিয়া উসমানিদের ধাওয়া করে। তাই উসমানিরা আর সফল হতে পারেনি।

এরই মধ্যে ইস্তাম্বুলের তারসানা অঞ্চলে ২৩/১২/১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তাতে রাশিয়ার পক্ষে অংশ নেয় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো আর উসমানিদের পক্ষে অংশ নেয় জার্মানি ইংল্যান্ড ফ্রান্স অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি এবং ইতালি। ইংল্যান্ডপ্রতিনিধি লর্ড মার্কি ভাবল, উসমানিরা একা পারবে না রাশিয়াকে কাবু করতে। তা ছাড়া তার রাষ্ট্র ইংল্যান্ডও যুদ্ধে সহায়তা করবে না উসমানিদের। কারণ, ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের আস্থাভাজন আলি পাশার মৃত্যুর পর ইংল্যান্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে উসমানিদের সাহায্য না করার। তাই লর্ড মার্কি ব্যক্তিগতভাবে উসমানিদের যুদ্ধবন্ধের জন্য একটু ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি দিতে বলল।

সুলতান আবদুল হামিদকে যখন চারিদিক থেকে ঘিরে নেওয়া হলো এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার কোনো শক্তি অক্ষত রইলো না, তখন লর্ড মার্কি সুলতানের মুখোমুখি হয়। আর তার রাশিয়ামুখী অবস্থানও জানিয়ে দেয়। তখনই মিদহাতের নেতৃত্বে কিছু লোক সুলতানকে যুদ্ধ ঘোষণায় বাধ্য করে। ২৪ এপ্রিল ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সূচিত যুদ্ধে রাশিয়া উসমানি রাজধানীর প্রান্তঘেষা সান স্টিফানোতে পৌঁছে যায়। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ সালে ইস্তাম্বুলে সান স্টিফানো চুক্তিতে স্বাক্ষর দাবি করে যুদ্ধবিরতি দেওয়া হয়।

২৯ দফা দাবি করে এই চুক্তিপত্র লিখিত হয়। এটা ছিল উসমানিদের বিরুদ্ধে মানহানিকর চুক্তিপত্র। তাতে ষষ্ঠ দফায় আছে, উসমানি সালতানাতের সীমানায় বুলগেরিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিতে হবে। বুলগেরিয়া হবে স্বায়ত্তশাসিত স্বাধীন রাষ্ট্র। এর সীমানা একদিকে বিস্তৃত হবে ইজিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত, আরেকদিকে হবে বর্তমান বুলগেরিয়া মেসিডোনিয়া ও থ্রেস (বর্তমান গ্রিস) পর্যন্ত। এমনকি বর্তমান তুরস্কের কিরক্লার ইলি জেলাও এই সীমানায় দাবি করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফা ছিল, মন্টিনেগ্রোকে উসমানি সালতানাত থেকে পৃথক করে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করা। তৃতীয় দফা ছিল, নিস-সহ সার্বিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করা। দুবরিজাসহ রোমানিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া। আর ১৯তম দফায় লেখা ছিল—আরদাহাম, বোরস, বাতুম, বাইজিদ এমনকি বর্তমান তুরস্কের সুগানলি পাহাড় পর্যন্ত রাশিয়াকে অবাধ বিচরণের সুযোগ দিতে হবে।

সান স্টিফানো চুক্তি যখন বহাল তবিয়তে সুলতান আবদুল হামিদের হাতে অর্পণ করা হয়, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি ডক নেক্লোকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেন এই বলে যে, যত রকম চাপ আসে আসুক; উসমানি সালতানাত এই চুক্তি মানবে না। পরবর্তীতে সুলতান আবদুল হামিদ চার মাস এগারো দিন পর তাতে পরিবর্তন এনে বার্লিন চুক্তিতে রূপ দেন, যা তুলনামূলক উসমানি সালতানাতের সম্মান রক্ষা করে [ইয়ালমাজ উজতুনার তারিখু তুর্কিয়্যা আল-কাবির (বৃহত্তর তুর্কির ইতিহাস) গ্রন্থ ৭/১৬১-১৬২ পৃষ্ঠা ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত]।

মিদহাতের যুদ্ধাগ্রহ : আমি দায়ী হবো কেন?

জনগণের পক্ষ থেকে পরিষ্কার বার্তা এল—আমরা যা চেয়েছি তা-ই সঠিক। আমরা যেহেতু বহুসংখ্যক মানুষ মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাই সিদ্ধান্তটি ভুল হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। আমরা মিদহাত পাশাকেই চাই। মিদহাত পাশাকেই প্রধানমন্ত্রীর আসনে দেখতে চাই। তাদের দাবি আসামাত্র আমি মিদহাতকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করি। তা ছাড়া জনগণও চাচ্ছে মিদহাত পাশাকে, তাহলে আর তার পক্ষে মত না দেওয়ার কী উপায়!

রাশিয়া যে প্রস্তাব আমাদের দিয়েছে, তার হ্যাঁ-নার দায়ও আমি জনগণকে দিলাম। তারা তাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে মিলে মিটিং-মাশোয়ারা করে নেবে—যুদ্ধে তারা জড়াবে নাকি যুদ্ধ পরিহার করবে!

তৎক্ষণাৎ মিদহাত পাশার সভাপতিত্বে ব্যতিক্রমী সাধারণ বোর্ড গঠন করা হয়।[১৪] সেখানে সুদীর্ঘ সময় আলোচনা-পর্যালোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে সবাই একমতাবলম্বী হয়। যেখানে জনগণ তাদের প্রিয় মিদহাত পাশার সভাপতিত্বে (যুদ্ধের) সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেখানেও আমাকে দোষ দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে। আমি যুদ্ধের দায় নেব কেন? আমি কি যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছি? সুতরাং (৯৩ রোমান ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ ১২৯৪ হিজরিতে সংঘটিত) যুদ্ধের[১৫] জন্য আমি ব্যক্তি হিসেবে দায়ী নই, এমনকি সুলতান হিসেবেও না।

আমার যতটুকু করণীয়, ততটুকু সম্পূর্ণভাবে করেছি। এমন যোগ্য থেকে যোগ্যতর সেনা-টিম আমি গঠন করেছি, যার নজির উসমানি ইতিহাসে বিরল।

---

[১৪] ১৮/০১/১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে (১২৯৪ হিজরি) ইস্তাম্বুলের বাবে আলিতে তড়িঘড়ি করেই এই সাধারণ বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডে ২৪০ জনের মধ্যে ৬০জন ছিল খ্রিষ্টান। বোর্ডের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে মিদহাত পাশা তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। তাতে সবাইকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার জোরালো আহ্বান জানান। উচ্চমাধ্যমিক মাদরাসার শিক্ষার্থীদের যুদ্ধের দাবি নিয়ে পথে নামার অনুপ্রেরণা দিলো। ছাত্ররাও যুদ্ধ যুদ্ধ বলে সুলতানি প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। উসমানি পত্রিকাগুলোকেও মিদহাত বলে দিলো, যুদ্ধের জন্য জনগণকে উত্তপ্ত করতে। এটা প্রচার করল যে, সাবেক সুলতান মুরাদ উন্মাদনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন, শিগগিরই তিনি সিংহাসনে বসবেন। এমনকি এটাও প্রচার করল মিদহাত যে, আবদুল হামিদ রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে; তাই যুদ্ধে জড়াতে উনি অনীহা প্রকাশ করছেন। (ইয়ালমাজ উজতুনা, প্রাগুক্ত ৭/১৩৮)

[১৫] (রোমান বর্ষপঞ্জি মোতাবেক) ৯৩ সালের যুদ্ধের আগেই লর্ড মার্কি স্যাল্‌সবেরি মিদহাতকে চিঠি লিখে সতর্ক করেছে যে, এমতাবস্থায় যুদ্ধে জড়ালে উসমানি সালতানাত ভয়ানক পরিণতির মুখে পড়বে। কিন্তু মিদহাত পাশার যেন একমুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস হয়নি রশিদ পাশার মন্ত্রিত্বকালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড যেমন রাশিয়ার বিরুদ্ধে উসমানি সালতানাতের পাশে ছিল; এবারের রাশিয়াযুদ্ধে তাদের কেউ পাশে থাকবে না। পরিণামে রাশিয়ান দানবের সামনে উসমানিদের একা বসে আঙুল চোষা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। (প্রাগুক্ত ৭/১৩৮পৃষ্ঠা)

ইতিহাসের সাথে নির্লজ্জ প্রতারণা হবে যদি যুদ্ধের দায় আমার কিংবা আমার সালতানাতের উপর চাপানো হয়। যুদ্ধপ্রক্রিয়া তথা পর্যাপ্ত যোগাযোগ-মাধ্যমের অনুপস্থিতি, আর রোমেলির[১৬] অমুসলিম জনপদে দ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠা এবং তা উসমানি আদরানা (আদ্রিয়ানোপল) প্রদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার দায়ও আমার নয়। এর দায় মিদহাতের। মিদহাতপন্থি জনগণের।

রাশিয়াযুদ্ধে আমার সেবাসমূহ

রাশিয়াযুদ্ধের কারণে সালতানাতজুড়ে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছি। ত্রাণ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছি। মুহাজির ভাইবোনদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করেছি। তাদের জন্য রেশন চালু করেছি। তুলনামূলক সহজভাবে জীবন কাটানোর যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছি।

আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সওয়াবের নিয়তে আমি খরচ করেছি। আল্লাহর ওইসব বান্দা-বান্দির হেফাজতের দায়িত্ব তো আমার। আগত মুহাজির ভাইদের জন্য মসজিদ-ফান্ড থেকেও খরচ করেছি।[১৭]

মুহাজির ভাইদের হাত পাতার ছবিগুলো এখনো আমার হৃদয়ে আবছা আলোর মতো মায়াবী। একমুঠো অন্নের জন্য কী কাতরতাই না ছিল!! আল্লাহর বান্দাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার কথা আমি ভুলতে পারিনি। আমি এসব বিষয় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলছি না, আমার রাজ্যে আগত মুহাজির ভাইবোনরাই তো আমার সৎকর্মের সাক্ষী। মুহাজির ভাইবোনরা যদি দীন-দাওলার এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করে, তাহলে আমি বরাবরের মতোই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং সহায়তা অব্যাহত রাখব।

মুহাজির ভাইবোনদের সেবা করে আমি অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় গদগদ নই। বরং এ আমার কর্তব্য ছিল। আমার অতীত কীর্তিগাথার টুকটাক স্মৃতিচারণ করলাম। বেঁচে থাকলে সবিস্তারে আমার ব্যর্থতার কথাও লিখে যাব।

হায়রে পথভোলা 'দেশপ্রেমিক' ডাক্তার নাজিম বেগ, আপনি বলেছিলেন—আপনিই নাকি সত্যের উপর আছেন। আরও বলেছিলেন—অশান্তির আগুন আবদুল হামিদই জ্বেলেছে।

---

[১৬] রোমেলি বলতে তৎকালীন তুর্কির থ্রেস, মেসোডোনিয়া, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, আলবেনিয়া ও এজিয়ানসাগরের ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সেসব দ্বীপ বুঝায়, যেগুলো উসমানিরা দখল করেছিল। (তারিফু বিল আমাকিনিল ওয়ারিদা ফিল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/২২; মাকতাবা শামেলা)।

[১৭] মুহাম্মদ ফরিদ বেগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুহাজির সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লাখ। উসমানি সালতানাতের জনসংখ্যা ছিল ৬৪ মিলিয়ন। আর বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ১ বিলিয়ন ৩২৬ মিলিয়ন। (ইয়ালমাজ উজতুনা, ৭/৩১৯)

ডাক্তার নাজিম সত্যবাদী ও সাহসী হলে তাকে স্বীকার করতে হবে—তারই জ্বালানো আগুনে ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস পার্টি পানির বদলে পেট্রোল ঢেলেছে।

নাহ, আর লিখতে পারছি না। বার্ধক্যের ক্লান্তি চেপে ধরেছে। সুযোগ পেলে মিদহাত পাশাকে নিয়ে কিছু লিখব, ইনশাআল্লাহ।

মিদহাত পাশা : ভালো গভর্নর তবে ব্যর্থ কূটনীতিক

আমার মরহুম পিতা সুলতান প্রথম আবদুল মজিদের শাসনামলের সর্বশেষ মন্ত্রী হলো মিদহাত পাশা। অবশ্য সর্বশেষ মন্ত্রী হলেও শেষের দিকেরই মন্ত্রী হবে বৈ কি। তুনা প্রদেশের সুন্দর সঠিক পরিচালনা করে উনি আমাদের মুগ্ধ করেন। যখন আমরা ইউরোপ ভ্রমণ করে ফিরলাম, তখনকার কথা এটা। আমার চাচা সুলতান আবদুল আজিজের সাথেই আমরা সফর করেছিলাম। চাচা তো ইউরোপের স্থাপত্যশিল্পে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছেন। ফেরার পথে তুনা প্রদেশ ঘুরে মিদহাত পাশার কাজের প্রশংসা করেন। তার জন্য দোয়াও করেন।

মিদহাত পাশাকে সুলতানি পরামর্শসভায় ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল তার মন্ত্রিত্বের পথ সুগম করা; যদিও উনি পরামর্শসভায় নিয়মিত যোগ দিতে পারেননি।

সুলতান আবদুল আজিজ অপছন্দ করতেন ইজাজ আলি পাশাকে। তা ছাড়া ইউরোপ থেকে ফিরে তার চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়। আলি পাশাকে ক্ষমতাসীন করার পেছনে তৃতীয় নেপোলিয়নের মনোভাব আমার চাচার কথা-কাজে সক্রিয় ছিল। যদিও তিনি কারো ইশারায় নিজের পরিচালিত হওয়ার বিষয়টা আঁচ করতে পারেননি।

আলি পাশা একদিন চাচার কাছে এলেন। বাগদাদ প্রদেশে ঘটমান কয়েকটি জরুরি সংবাদ দিলেন। শিয়া-উপদ্রব বেড়ে যাওয়ার দুঃসংবাদও দিলেন। হাসান-হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মাজার নিয়ে শাহে আজমের বাড়াবাড়ির কথা জানালেন।[১৮] একদিন ঝোপ বুঝে কোপ দিলেন। আমার চাচা সুলতান আবদুল আজিজকে বললেন, তাকিউদ্দীন পাশা তো রাজ্য পরিচালনা করতে পারে না। আপনার মর্জি হলে নেতৃত্ব বহনে আমার আপত্তি নেই।

আলি পাশার ধারণা ছিল সুলতান কিছুতেই খেলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুল থেকে তাকে বেরুতে দেবে না। পরে তার কল্পনাই বাস্তব হলো। সুলতান আবদুল আজিজ বললেন, বাবেআলিতে তো গভর্নর হওয়ার যোগ্য কাউকে দেখছি না। পরে মিদহাত পাশাই বাগদাদের গভর্নর হয়ে গেলেন।

---

[১৮] হজরত হাসান রা. ও হজরত হোসাইন রা. এর সমাধিকে 'আতাবাতে মুকাদ্দাসা বা আতাবাতে আলিয়া' বলা হয়।

বাগদাদ প্রদেশের সীমানা তখন অনেকদূর বিস্তৃত ছিল। আমার জানামতে, মিদহাত পাশা সেখানে তিন বছর গভর্নর হিসেবে পর্যাপ্ত অবদান রাখেন। শুনেছি, প্রথমে উনি যেতে চাননি। পরে অবশ্য এজন্য আফসোস করেছেন।

মিদহাত পাশাকে বরখাস্ত করে প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ নাদিমকে তার স্থলাভিষিক্ত করা আলি পাশার ভুল ছিল।

যে লোক আলি পাশাকে পরোয়া করেন না, ওই লোক তো মাহমুদ নাদিম পাশার জন্য বিপজ্জনকই হবেন। বাস্তবে তা-ই হলো। মিদহাত পাশা আদরানা প্রদেশে ইস্তাম্বুল হয়েই গেলেন। এভাবে সুলতানের কাছে উপস্থিত হওয়ার একটি সুযোগ তার হাতে আসে। এই সুযোগকে মিদহাত পাশা কাজে লাগায়, ফলে নাদিম পাশা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ছিটকে পড়েন। মিদহাত পাশা সেই পদে আসীন হন।

মিদহাত পাশা ভালো গভর্নর ছিলেন সত্য; তবে কূটনৈতিক পদক্ষেপে ভুল ছিল। সুলতান এবং বিশ্বস্ত মন্ত্রিবর্গ যাদের সন্দেহের চোখে দেখতেন, তাদের সাথেই মিদহাত পাশার মাখামাখি বেশি ছিল। প্রধানমন্ত্রী মিদহাত পাশার মুখ ও প্রাসাদ থেকে এমনসব কথা ও মন্তব্য এসেছে, যা ক্ষমার অযোগ্য, যা শুধু প্রাচ্যের সুলতানের কাছেই নয়; বরং অধিকাংশ গণতান্ত্রিক কোর্টেও আইনত দণ্ডনীয়।

চাচার অনুগ্রহ আর আউনি পাশার বিদ্রোহ

আমার চাচা সুলতান আবদুল আজিজকে 'সরিয়ে দেওয়া'র কূটচাল হুসেন আউনি পাশাই প্রথম করেছে। কারণ সুলতান আউনিকে ইস্পার্টায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সুলতান আবদুল আজিজ ছিলেন শান্ত মেজাজের মানুষ। সবার প্রতি সুধারণা পোষণ করে চলতেন। আউনি পাশার মতো চালবাজকে ক্ষমা করেছেন শুধু এটুকুই নয়; উনাকে সেনাকর্মকর্তাও (যুদ্ধমন্ত্রী) বানিয়েছেন। এভাবেই জীবনের বড় ভুলটা তিনি করলেন।

আউনি পাশার সাথে মিদহাত পাশারও অংশগ্রহণ ছিল সুলতানের অপসারণে। এভাবেই উনি চিহ্নিত হয়ে যান। বিদ্রোহীদের দলে মিশে যান। আর বিচারক অপসারণে অংশগ্রহণকারীকে কোনো বিচারকই পছন্দ করে না। যদিও নবাগত বিচারক সাবেক বিচারকের শত্রুও হয়। আর সবাই জানে, বিদ্রোহীরা নির্মাণের চেয়ে বেশি করে ধ্বংস।

যাই হোক, আমি সিংহাসনে আরোহণের সময় মিদহাত পাশা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। আমিই উনাকে এই পদে বসিয়েছি। জনপ্রিয় হওয়ায় আমি তাকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করি। অবশ্য উনি অনড় ইচ্ছাশক্তিরও অধিকারী।

একরোখা মিদহাতের গণতন্ত্রমুখিতা

আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে, মিদহাত পাশা যদি প্রধানমন্ত্রী হয়েও চৌকশ কূটনীতিক হতেন, তাহলে উনি রাশিয়াযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তার মন্ত্রিত্বে অটল থাকতেন। প্রথমদিন থেকেই উনি আমার সাথে আদেশের ভাষায় কথা বলতেন। উনার কাজকর্মে গণতান্ত্রিক নীতিমালার ছিটেফোঁটাও ছিল না। গোঁয়ারতুমি উনাকে জাপটে বসেছিল।

যারা মিদহাত পাশাকে চিনেন তারা জানেন, কী পরিমাণ একরোখা ছিলেন উনি স্বমত ও পথে। তুনা প্রদেশের গভর্নর থাকার কাল থেকেই মিদহাত পাশার প্রিয় বন্ধু রমিজ মাওলা। আর মিদহাত পাশার সাথে সীমাতিরিক্ত বন্ধুত্বই তার জন্য কাল হয়। রমিজ মাওলাকে ইস্তাম্বুলের বাইরে নির্বাসিত দিন কাটাতে হয় সেজন্য। বৈরুত প্রদেশের সংসদে একটি সমস্যার সমাধান দেওয়ার সময় বৈরুতের কেন্দ্রীয় নায়েব রমিজ মাওলা বলেছেন—তুনা প্রদেশ পরিচালনাকালে উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধান কেবল মিদহাত পাশাই দিয়েছে। অন্যকাউকে মতপ্রকাশের সুযোগ দেয়নি। পাশা শুধু ব্যক্তিস্বাধীনতাকেই প্রাধান্য দিতো। জাতীয় স্বার্থে মাথা ঘামাত না। এ ছাড়া সে ছিল মারাত্মক একরোখা।

রমিজ মাওলার কথাটা একলোকের ভালো লাগল না। ওই লোক মিদহাত পাশাকে না দেখেই তার কর্মে মুগ্ধ ছিল। ও রাগে ফুঁসছিল, এটা খেয়াল করে রমিজ মাওলা সভা শেষে ওই লোককে ডেকে লম্বা সাদা দাড়িতে হাত রেখে বললেন—শোন ব্যাটা, বয়স বেড়েছে বলেই আমার কালো দাড়ি সাদা হয়নি; বরং প্রবাসের কষ্টও দাড়ি সাদা হওয়ার কারণ। প্রবাস ও নির্বাসনের কষ্ট আমি মিদহাত পাশার কারণেই সহ্য করেছি। সভায় যা বলেছি মিদহাতকে নিয়ে, তা আমি তার সামনেই বহুবার বলেছি। আমি কারচুপি করে কথা বলার লোক নই। যা সত্য তা-ই বলি অকপটে।

রমিজ মাওলার মৃত্যুর পর সেই অঞ্চলের মানুষই আমাকে এই ঘটনা শুনিয়েছে।

মিদহাতপন্থিদের মাদকাসক্তি

সংবিধানকেন্দ্রিক সুলতানি ফরমান আমি সচল করলাম। তখন দ্বিতীয়বারের মতো মিদহাত পাশা প্রধানমন্ত্রী। সেদিনই সন্ধ্যায় মিদহাত পাশার মহলে 'স্বাধীনচেতা' কবি-সাহিত্যিকরা একত্রিত হয়। রাজনৈতিক আলাপচারিতার জন্য নয়; বরং বিনোদনের জন্য। ওরা মদ নিংড়াচ্ছিল। আর মিদহাত পাশা তো যৌবনকাল থেকেই মাদকাসক্ত ছিল।

নেশায় মাতাল হয়ে ওই সুলতানি ফরমান সময়ের আগেই ফাঁস করে দেন। অনেক রাতে অন্যদের কাঁধে ভর করে মিদহাত পাশা হেলেদুলে বেরিয়ে আসছিলেন। বিদ্ঘুটে ভঙ্গিতে মদের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে তার বোনজামাই তুসুন পাশাকে বললেন—পাশা, আমার সিংহাসন থেকে কে সরাবে আমাকে? আমি কত বছর সিংহাসনে আসীন থাকব, হিসাব আছে?! তুসুন পাশা উত্তরে এই বলে প্রাসাদের একটা ঘরে মিদহাতকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিলেন যে, 'মাদক নিয়ে মজে থাকলে এক সপ্তাহের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না।'

আমি মিদহাত পাশাকে মূল্যায়ন করি। কারণ উনি ছিলেন উদ্যমী বুদ্ধিমান গভর্নর। তবে গুণপরিমাণ দোষও তার ছিল। উনি রাজনৈতিক ব্যস্ততার কারণে সাফওয়াত পাশা এবং আদহাম পাশাকে[১৯] নাগালে পাননি।

মিদহাত পাশা তুনায় গভর্নর থাকার সময়ে, 'বুলগেরীয় বিদ্যালয়ে বুলগেরিয়ান ভাষায় শিক্ষাদান' বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেছিলেন। উনার পাশের লোকেরা উনাকে এই রাজনীতির অশুভ পরিণতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। তখন উনি মত পালটে বলেছেন—যে ভাষায় ইচ্ছা পাঠদান করা হোক, তবে পাঠদান যেন বন্ধ না হয়।

তবে বারবার বুলগেরীয় ভাষা বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছে; কারণ তাতে বহিরাগত বিদেশি সুবিধা ছিল।

মিদহাতের মৃত্যু[২০] : আমার অসম্পৃক্ততা

আদালতে সুলতান আবদুল আজিজ-হত্যার মামলা ধাপে-ধাপে চলছিল। সেই মামলায় আমি কোনো হস্তক্ষেপ করিনি। তবে আসামিদের ফাঁসির রায় শিথিল করেছি। মিদহাতের মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক, তাতে আমার কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না।

মিদহাতের মৃত্যুর দশ বছর পর ইউরোপে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে সবিস্তারে সঠিকভাবে মিদহাত-হত্যায় জড়িতদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেই তালিকায় আমার সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন একজন লোকের নামও নেই।

---

[১৯] আদহাম পাশা (১৮৮৪-১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ) : তুরস্কের ইস্তাম্বুলে জন্মেছিলেন। মৃত্যু হয়েছে মিশরের কায়রোতে। তানজিম সংসদের উপদেষ্টা ও মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে গ্রিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত উসমানি সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানও নির্বাচিত হয়েছেন সুলতান আবদুল হামিদের সিদ্ধান্তে।

[২০] মিদহাত পাশার মাদকাসক্তি বিষয়ে ইয়ালমাজ উজতুনা বলেন, মিদহাতের প্রাসাদে প্রতিরাতেই মদের আসর জমত। সেখানে দুজন কবিও উপস্থিত হতেন; নামিক কামাল ও জিয়া পাশা। এইসব আসরে মিদহাত প্রকাশ করে দিতেন সালতানাতের সিক্রেট। পরের দিনই তা ইস্তাম্বুলবাসীর কাছে ছড়িয়ে পড়ত। একবার বলেছিলেন, উসমানি সালতানাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন। তারপর ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়নের মতো মহারাজ হবেন। (প্রাগুক্ত, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

আমি মিদহাত পাশাকে নিয়ে সর্বদা শঙ্কিত থাকতাম। তাই বলে উনার প্রতি জুলুম করার অসদিচ্ছা আমার কখনোই ছিল না। কিন্তু যখন আদালত তার ফাঁসির রায় দিল তখন আমার আর কী করার ছিল? একজন পরিচিত লোক বলল যে, ফাঁসি দেওয়া না হোক। কিন্তু কী লাভ তখন বলে? তা ছাড়া আমার শত্রুকে আমি শহিদের কাতারে দাঁড় করালে আমার তো বিন্দুমাত্র লাভ নেই।

ইতিহাসে আমার এবং অন্যান্য শাসকের পার্থক্য

মিদহাত-হত্যার অপবাদ আমাকে দিলে ঠিক আছে, আমি তা মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও মেনে নেব। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যে, ইতিহাসে কি এমন খলিফার অভাব আছে, যিনি খলিফার জন্য হুমকিস্বরূপ কিংবা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীকে চিরতরে বিদায় করে দিয়েছেন?

ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম চরিত্র আব্বাসি খলিফা মানসুর কি আবু মুসলিম খোরাসানিকে হত্যা করতে বাধ্য হননি? খলিফা হারুনুর রশিদ তো তার প্রিয়তম বন্ধু জাফর বারমাকিকে মেরেই ক্ষান্ত হননি, জাফরের স্বজনদের উপরও নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।

মিদহাত পাশার সাথে আমার আচরণ কি ওইসবের বিচারে কঠিন নির্দয়? হ্যাঁ, অবশ্যই আমি সতর্কতা-হেতু উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি ওইসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে, যা সুযোগ পেলেই মিদহাত পাশা ঘটিয়ে বসত। আমি তার পরিবারের কোনো ক্ষতি করিনি; বরং বসে বসে খাওয়ার মতো রেশন চালু করেছি। মিদহাতের ভাবশিষ্য আবদুর রহমান পাশা এবং খলিল রাফাত পাশাকে প্রধানমন্ত্রিত্বের আসনে করেছি সমাসীন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে তার আত্মীয় উপদেষ্টা শাকের পাশা ও রায়েফ পাশাকে নিযুক্ত করেছি। ভার্নার যুদ্ধে উসমানিদের পক্ষে বিজয় অর্জনকারী প্রধানমন্ত্রী খলিল পাশাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন মহান সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতিহ। আর এই ঘটনা কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে প্রমাণিত। ওই বই থেকে নয়, যা ইতালির রোমকে উসকে দিতে লিখিত হয়েছে। আচ্ছা, এই দাবি কি করা যায় যে, সকুল্লু মুহাম্মদ পাশার মৃত্যুতে সুলতান তৃতীয় মুরাদের কোনো ভূমিকা ছিল না? আমার দাদা দ্বিতীয় মুহাম্মদ থেকে ইলমদার মুসতফা পাশার বেলায় কল্যাণকর কী এমন প্রকাশ পেয়েছে? থাক, অতো দূরে যাওয়ার কী দরকার! এই তো বছরচারেক আগে আমি 'ঘটনাপঞ্জি সংকলন'[১১] বইয়ে পড়েছি যে, মুহাম্মদ শওকত পাশাকে কখন কোথায় কীভাবে হত্যা করা হবে তা সবাই জানত। প্রধানমন্ত্রী ও রণমন্ত্রীকে দিনের আলোতে প্রকাশ্যে সতেরোটি গুলি

[১১] تقويم الوقائع

করে ছিন্নভিন্ন করে হত্যা করার বিষয়টি পুলিশ ও রক্ষীরা সবাই জানা সত্ত্বেও পুলিশ ও রক্ষীদের কেউ মাথা ঘামায়নি। এমনকি ঘটনাস্থলে কারও পদচিহ্নও পাওয়া যায়নি। হত্যাকারীরা যদি খোঁড়া নাও হতো, তবু তারা গাড়ি নিয়ে পালাতে পারত না। কিন্তু অপরাধীরা লুকিয়ে আছে। পুলিশের লোকেরা জেনেও না-জানার ভান করে আছে।

মিদহাত পাশাকে নিয়ে এতো কথা এজন্য লিপিবদ্ধ করলাম যে, মিদহাত নিজ অবাধ্যতা এবং আমার বিরোধিতা করে ইতিহাসে ধিকৃত। আমার নামের পেছনে তার নামও কুৎসিত দাগ হয়ে থাকবে। ভালোর বিপরীতে তো খারাপের কথা ওঠেই।

বিদ্রোহীরা বলে, মিদহাত পাশাই উসমানি সালতানাতে সংবিধান-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। বাস্তবতা হলো, উনি গণতন্ত্রের পুরোনো সমর্থক ছিল মাত্র। পত্রপত্রিকায় নানা ইস্যুতে উনি পরিচিত হওয়ায় তার নামের সাথে মানুষ এই কীর্তি এঁটে দিয়েছে। মিদহাতই প্রথম প্রবর্তক নয়।

পাশ্চাত্যের অন্ধ-অনুসরণই মিদহাতের গণতন্ত্র

আমেরিকার গণতান্ত্রিক সরকার-ব্যবস্থার উপকারিতা ছাড়া কিছুই বিবেচনা করেনি মিদহাত পাশা। গণতন্ত্রের কারণ এবং অন্যান্য প্রভাব বিষয়ে প্রাথমিক পড়াশোনাও করেনি সে। সবরকম অসুস্থতা এবং দেহকাঠামোর জন্য যেমন ট্যাবলেট উপযোগী নয় তেমনি গণতান্ত্রিক সরকার-ব্যবস্থা সবজাতি ও গোত্রের জন্য উপযোগী নয়। আমার আগে থেকেই মনে হতো, গণতন্ত্র হলো অনুপকারী শাসন-ব্যবস্থা। আর এখন তো আমি এর অনুপকারের ভুক্তভোগী।

মিদহাত পাশা কোনো গোত্র বা রাষ্ট্রের সংবিধান তখনো ছুঁয়ে দেখেনি, যখন সে আমাকে সংবিধান ঘোষণা করতে পীড়াপীড়ি করছিল। সংবিধান বিষয়ে তার মৌলিক কোনো মতামতও ছিল না। উদিয়ান আফেন্দি ছিল মিদহাতের চিন্তাগুরু। আর্মেনীয় উদিয়ান আফেন্দি যোগ্য বিধায়ক ছিল না; আরে সে তো মানচিত্রই বুঝত না! সে মানচিত্র বোধে অক্ষম হওয়াতেই তো মিদহাত পাশাকে তায়েফ দুর্গে নিয়ে গিয়েছিল।

১২৯৩ (রোমান বর্ষপঞ্জি মোতাবেক, ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ, ১২৯৪ হিজরি) সনে জিয়া পাশা, কামাল বেগ ও আবেদিন পাশা মিলে সাংবিধানিক খসড়া প্রস্তুত করেন। তেমনি সেক্রেটারি সাইদ পাশা এবং সামরিক স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক সোলাইমান পাশাও খসড়া প্রস্তুত করে আমার কাছে নিয়ে আসেন। আমি খেয়াল করলাম, এইসব লোকের পারস্পরিক চিন্তায় কোনো মিল নেই। কামাল বেগ মিদহাত পাশার বিরোধী, তেমনি সাইদ পাশা তার বন্ধুদের বিরোধী। তারা সবাই